এক যাত্রা, পৃথক ফল: ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও অসাম্য

মৈত্রীশ ঘটক

এক

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের পর স্বাধীনতা-উত্তর ভারত জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকোচনটি (৭.৩ শতাংশ) প্রত্যক্ষ করল ২০২১ সালে। তার পরে আরও এক বছর কেটেছে এবং অর্থনীতির চাকা আস্তে হলেও খানিকটা ঘুরতে শুরু করেছে। তাহলেও ২০১৯ সালের সাথে তুলনা করলে ২০২২ সালে জাতীয় আয় প্রথমে কমে তারপর বেড়ে মোটামুটি শেষমেশ একই জায়গায় পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্লথগতি শুরু হয়েছিল, কোভিড পর্বের আগে থেকেই— গত পাঁচ বছরের আয়বৃদ্ধির হারের হিসেবে করলে সত্তরের দশকের পরে এরকম ঢিমে গতি দেখা যায়নি।

তা সত্ত্বেও স্টক মার্কেট কিন্তু দিব্যি টগবগিয়ে চলছে। লকডাউনের ঠিক পরেই যে ধাক্কা খেয়েছিল, তার ঠিক একবছরের মধ্যেই সেনসেক্সের মান বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, এবং তারপরেও সেই অশ্বগতি অক্ষুণ্ণই থেকেছে। *ফোর্বস* পত্রিকার বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে বিলিয়নপতি ধনকুবেরের সংখ্যা এই কোভিডের বছরে ১০২ ছিল, তার থেকে বেড়ে এ বছরে দাঁড়িয়েছে ১৬৬-তে। বিলিয়নপতির সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে ভারত তৃতীয় স্থানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের পরেই। পাশাপাশি দেখুন, পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর ২০২১ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে কোভিড-১৯-এর ধাক্কায় ভারতে গরিবের সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে সাত কোটি, যা কিনা পুরো বিশ্বে দারিদ্র্য বৃদ্ধির ৬০%।

এখন ভারতের জনসংখ্যা যেহেতু বেশি, তাই যে কোনো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই বিচার করা হোক (যেমন, দীর্ঘকায় বা হ্রস্বকায়), সংখ্যার বিচারে অনেক লোক থাকতে পারে। তাই মনে হতে পারে যে ধনকুবেরেরও সংখ্যা ভারতে বেশি হতেই পারে— এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। কিন্তু জনসংখ্যা এবং গড় আয় ধরে হিসেব করলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারতে ধনকুবেরের সংখ্যা যত হওয়ার কথা, তার তুলনায় অন্য দেশগুলোর থেকে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, মনে রাখতে হবে একই সঙ্গে ভারতে অতি দরিদ্রের সংখ্যাও বিশ্বের মোট জনসংখ্যায় ভারতের ভাগের থেকে বেশি। ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭.৮ শতাংশ, আর সারা বিশ্বে অতি-দারিদ্র্যে দিন গুজরান করা জনসংখ্যার ২০.১৭ শতাংশ মানুষ ভারতেই।

তবে ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্যের সমস্যাটা বুঝতে শুধু ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় অতি-ধনী আর অতি-দরিদ্র দুই শ্রেণীরই মানুষ অন্য দেশের তুলনায় বেশি, এর বাইরে গিয়ে প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান আরেকটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

দুই

থমাস পিকেটি (ফরাসি উচ্চারণে 'তোমা পিকেতি') এবং তার সহকর্মীদের হাতে তৈরি বিশ্ব বৈষম্য তথ্যপুঞ্জ (World Inequality Database) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে সম্পদ এবং আয়ের ক্ষেত্রে অসাম্যের মোটামুটি স্বচ্ছ একটা ছবি তুলে ধরে। ভারতেও সম্পদ এবং আয়— উভয় ক্ষেত্রেই অসাম্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে। আমরা প্রথমে সময়ের নিরিখে সম্পদের অসাম্যের বিবর্তনের ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখব (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৬১ সাল— অর্থাৎ, প্রথম যে বছর থেকে আমরা এই বিষয়ে তথ্য পাই— থেকে ১৯৮১ সাল অবধি, সবচেয়ে ওপরের স্তরের ১ শতাংশের মোট সম্পদের ভাগ মোটামুটি ১২%-এর আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। ১৯৯১, অর্থাৎ উদারীকরণের বছর থেকে তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০ সালে ৪২.৫%-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের নিরিখে সবচেয়ে নীচের তলার ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মোট সম্পদের ভাগ ১৯৬৩ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে সামান্য হ্রাস পেয়ে প্রথমে ১২.৩% থেকে ১০.৯% নামে, এবং তার পরে দ্রুত গতিতে কমে ২০২০ সালে তা মাত্র ২.৮ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। মধ্যস্তরের ৪০ শতাংশ মানুষের মোট সম্পদের ভাগ একই পথ অনুসরণ করেছিল; ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৪৫%-এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার পর ক্রমাগত তা নামতে থাকে এবং ২০২০ সালে তা ২২.৯ শতাংশে নেমে আসে।

সারণী ১: সময়ের নিরিখে ভারতে সম্পদের অসাম্য, ১৯৬১-২০২০

	সর্বোচ্চ ১%	উঁচুতলার ১০%	মাঝের ৪০%	নীচের ৫০%
১৯৬১	১১.৯%	৪৩.২%	৪৪.৫%	১২.৩%
১৯৭১	১১.২%	৪২.৩%	৪৬.০%	১১.৮%
১৯৮১	১২.৫%	৪৫.০%	৪৪.১%	১০.৯%
১৯৯১	১৬.১%	৫০.৫%	৪০.৭%	৮.৮%
২০০২	২৪.৪%	৫৫.৬%	৩৬.৩%	৮.২%
২০১২	৩০.৭%	৬২.৮%	৩০.৪%	৬.৪%
২০২০	৪২.৫%	৭৪.৩%	২২.৯%	২.৮%

উৎস: তথ্য নেওয়া হয়েছে World Inequality Database থেকে।

ভারতে সম্পদের অসাম্যকে অন্যান্য কয়েকটি দেশের অর্থনীতিগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে (সারণী ২ দ্রষ্টব্য), ভারতে সর্বোচ্চ স্তরের ১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন স্তরের ৫০ শতাংশের মধ্যে ব্যবধান তুলনামূলকভাবে বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারে সকলকে ছাপিয়ে গেলেও, ভারত কেবল রাশিয়ার চেয়ে সামান্য পিছিয়ে। এমনকি ফ্রান্স আর চিনের থেকেও ভারতে এই ব্যবধান বেশি মাত্রায় রয়েছে।

সারণী ২: সম্পদের অসাম্য, নানা দেশে, ২০১২

	সর্বোচ্চ ১%	উঁচুতলার ১০%	মাঝের ৪০%	নীচের ৫০%
ভারত	৩.০.৭%	৬২.৮%	৩০.৮%	৬.৪%
চিন	২৭.৩%	৬৬.৫%	২৬.৯%	৬.৬%
ফ্রান্স	২২.৩%	৫৪.৫%	৩৯.১%	৬.৪%
দক্ষিণ কোরিয়া	২৬.৯%	৬৭.২%	৩১.০%	১.৮%
রাশিয়া	৩৫.৫%	৬৭.৯%	২৮.৪%	৩.৭%
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৭.২%	৮৮.৯%	১৬.৫%	(-)৫.৩%
ব্রিটেন	১৯.৯%	৫১.৯%	n/a	n/a
মার্কিন যুক্তরাট	৩৫.৭%	৭২.৬%	২৬.৬%	০.৯%

উৎস: তথ্য নেওয়া হয়েছে World Inequality Database থেকে। এই লেখাটি লেখার সময় সর্বশেষ যে বছরের জন্যে ভারত ও অন্য কয়েকটি দেশের তুলনামূলক তথ্য পাওয়া গেছে, তা হল ২০১২।

এবার সম্পদ ছেড়ে আয়ের অসাম্যের বিবর্তনের দিকে তাকানো যাক (সারণী ৩ দ্রষ্টব্য)। এখানে, মোট আয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ১ শতাংশের ভাগ ছিল ১৯৬১ সালে ১৩%, এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে ১৯৬১ সালে তা দাঁড়ায় ৬.৯%। তারপর, ১৯৯০-এর দশকে তা আবার উপরে উঠতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে ১০.৪% থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে তা হয় ২১.৭%। সাধারণভাবে, আয়ের তুলনায় সম্পদ এমনিতেই বেশি কেন্দ্রীভূত হয় কারণ, সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রজন্মান্তরে চলতে থাকা একটা পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আয়ের নিরিখে নীচের দিকের ৫০ শতাংশের মোট আয়ের ভাগ ১৯৬১ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে মোটামুটি ২১% থেকে ২৩% মধ্যেই কিছুটা স্থিতিশীলভাবে ঘোরাফেরা করত, কিন্তু তারপর থেকে এটি হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে ২২.২% থেকে ২০১৯ সালে ১৪.৭%-এ নেমে আসে। মাঝামাঝি ৪০ শতাংশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ছবি দেখা যাচ্ছে—১৯৬১ সালে ৪২.৬% থেকে ২০১৯ সালে ২৯.%-এ নেমে আসা।

সারণী ৩: ভারতে আয়ের অসাম্য সময়ের নিরিখে, ১৯৬১-২০১৯

	সর্বোচ্চ ১%	উঁচুতলার ১০%	মাঝের ৪০%	নীচের ৫০%
১৯৬১	১৩.০%	৩৭.২%	৪২.৬%	২১.২%
১৯৭১	১১.৭%	৩৪.৪%	৪৪.০%	২২.৮%
১৯৮১	৬.৯%	৩০.৭%	৪৭.২%	২৩.৫%
১৯৯১	১০.৪%	৩৪.১%	৪৪.৯%	২২.২%
২০০২	১৭.১%	৪২.১%	৩৯.২%	১৯.৭%
২০১২	২১.৭%	৫৫.০%	৩০.৫%	১৫.১%
২০২০	২১.৭%	৫৬.১%	২৯.৭%	১৪.৭%

উৎস: তথ্য নেওয়া হয়েছে World Inequality Database থেকে। এই লেখাটি লেখার সময় সর্বশেষ যে সালের তথ্য পাওয়া গেছে তা হল ২০১৯।

দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ ১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশের মধ্যে ব্যবধানের ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মতো অন্যান্য সব দেশগুলোকে পেছনে ফেলেছে (দ্রষ্টব্য সারণী ৪)।

সারণী ৪: আয়ের অসাম্য, নানা দেশে, ২০১৯

	সর্বোচ্চ ১%	উঁচুতলার ১০%	মাঝের ৪০%	নীচের ৫০%
ভারত	২১.৭%	৫৬.১%	২৯.৭%	১৪.৭%
চিন	১৪.০%	৪১.৪%	৪৪.০%	১৪.৮%
ফ্রান্স	১০.০%	৩২.২%	৪৬.১%	২২.০%
দক্ষিণ কোরিয়া	১৩.২%	৪৪.৯%	৩৮.০%	১৯.২%
রাশিয়া	২১.৫%	৪৬.১%	৩৬.৬%	১৭.৭%
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯.৩%	৬৫.১%	২৮.৮%	৬.৩%
ব্রিটেন	১২.৯%	৩৫.৩%	৪৩.৯%	২১.৫%
মার্কিন যুক্তরাট	১৮.৮%	৪৫.৪%	৪১.২%	১৩.৫%

উৎস: তথ্য নেওয়া হয়েছে Wealth Inequality Database থেকে। এই লেখাটি লেখার সময় সর্বশেষ যে সালের তথ্য পাওয়া গেছে তা হল ২০১৯।

মোদ্দা কথা কী দাঁড়াল? সমসাময়িক ভারতে সম্পদ এবং আয়ের বৈষম্য অন্যান্য নানা দেশের (যার মধ্যে উন্নত এবং অনুন্নত দেশ দুইই আছে) তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বেশি। আর এই বৈষম্যের যে প্রবণতা, তা বেড়েছে আর্থিক উদারীকরণের সময় থেকে। সারণীগুলো থেকে স্পষ্ট যে ১৯৯০-এর দশক থেকে অর্থনীতি দ্রুত হারে বেড়েছে কিন্তু তার সাথে অসাম্যও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

এই ছবির অন্য একটা দিক আছে সেটাও দেখতে হবে। বৃদ্ধির সঙ্গে অসাম্য একটা সমীকরণ বজায় রেখে বেড়ে চলে— এ কথার অর্থ এই নয় যে বৃদ্ধি একটা পরিত্যাজ্য বিষয়। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিলেন ৪৫ শতাংশ মানুষ। শেষ যে বছরের সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, সেই ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা তার প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। সুতরাং, বৃদ্ধি যেমন অসাম্য বাড়িয়েছে, তেমনি তা দারিদ্র্যও কমিয়েছে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যে অসাম্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়— এ ব্যাপারটা প্রথম তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সাইমন কুজনেটস। জাতীয় আয়ের তথ্য নিয়ে এক দিগন্তপ্রসারী কাজের জন্য তিনি ১৯৭১ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে একদিকে যেমন নিত্যনতুন সুযোগ তৈরি হয়, তেমনি যারা বেশি ধনী তারা সেই সুযোগ থেকে বেশি সুবিধা তৈরি করে নিতে থাকে। পাশাপাশি, অদক্ষ শ্রমিকদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী কম মজুরিতে কাজ করে। অতএব, অসাম্য বাড়ে। এই তত্ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন এখন দেখা যাচ্ছে ভারতে। গরিবদের তুলনায়

ধনীদের আয় দ্রুতহারে বেড়েছে। ১৯৯৮ এবং ২০১৯-এর জনপ্রতি জিডিপির তুলনা করলে দেখা যাবে ৮.৫ গুণ বেড়েছে। অথচ গ্রামীণ মজুরির ক্ষেত্রে তা বেড়েছে মাত্র ৫.৪ গুণ।

তিন

উপরের আলোচনাটি একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে যা নীতি-নির্ধারণ বা উন্নয়নের গতিপথ নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্কে প্রতিফলিত হয়। দ্বন্দ্বটা হল বৃদ্ধি-ভিত্তিক আখ্যান বনাম অসাম্য-ভিত্তিক আখ্যান। কোনো একটা আখ্যানে চোখ রেখে দেখার সমস্যাটা হল তা আমাদের বৃদ্ধি এবং অসাম্যের মধ্যে সম্পর্ককে যথাযথভাবে অনুধাবন না করে, যান্ত্রিকভাবে শুধু অসাম্য হ্রাস করার বা বৃদ্ধিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কানাগলিতে ঢুকিয়ে ছেড়ে দেয়।

প্রথমে শুধু অসাম্য-ভিত্তিক আখ্যানটি একটু যাচিয়ে দেখা যাক। উদাহরণ হিসেবে, পুনর্বণ্টনের যুক্তিটাই ধরা যেতে পারে। পুনর্বণ্টন অসাম্য হ্রাস করতে পারে কিন্তু এটি দারিদ্র্যের কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার করতে পারে না। জিডিপির মোট বিলিয়নপতিদের সম্পদের অনুপাত ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে (১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই অনুপাত ১ শতাংশ দিয়ে শুরু হয়েছিল)। জিডিপির হিসাবে রাজস্ব যেখানে মাত্র ১২ শতাংশ, সেখানে এটা বেশ বড় একটা পরিমাণ। যদি আমরা এই বিলিয়নপতিদের মোট সম্পদ কেড়ে নিই এবং এই সম্পূর্ণটা দরিদ্রদের (১৩৯ মিলিয়ন ভারতীয়) মধ্যে ভাগ করে দিই, প্রত্যেক লোক ৩,১৭,৯২০ করে টাকা পাবে।

এখন এই হিসেব দেখে টাকার অঙ্কটা জনপ্রতি বেশ বড় মনে হয় বটে, কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এই পরিমাণ টাকা দিয়ে মাত্র ১৮ বছরের জন্যই দারিদ্র্যসীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। আর শহরাঞ্চলের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এই পরিমাণ টাকা দিয়ে মাত্র ১২ বছরের জন্য দারিদ্র্যসীমার মধ্যে নিয়ে এসে রাখা সম্ভব। ভারতে একজন ব্যক্তির গড় আয়ু, যা কিনা ৭০ বছর— সেই বিবেচনায় এই পুনর্বণ্টন স্রেফ একটা অস্থায়ী সাময়িক সহায়তা দেওয়ার মতো ব্যাপার। এতে দারিদ্র্যের উপর স্থায়ী কোনো প্রভাব পড়বে না। আরও গুরুতর জায়গাটা হল, এটা স্রেফ একটা এককালীন ব্যাপার হবে। যান্ত্রিকভাবে শুধু অসাম্যের দিকে দেখলে চলবে না, মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণের খাতে উপযুক্ত সরকারি বিনিয়োগ ছাড়া এই পথে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জীবনে আমূল কোনো পরিবর্তন আসবে না।

বৃদ্ধি-ভিত্তিক আখ্যানটিকেও একবার আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখা যাক। এটা ঘটনা যে বৃদ্ধিজাত সুযোগসুবিধাগুলি গরিবদের জীবনে ছাপ ফেলতে অনেক সময় নেয়।

অন্যভাবে দেখতে গেলে, ধরা যাক আমরা দারিদ্র্যসীমার আয়ের সংজ্ঞা যে আয়ের স্তরটি, তা ২০ শতাংশ বাড়ালাম (বাড়ানো সত্ত্বেও এটা পরিমাণ হিসেবে যথেষ্ট কম)। তবুও, হালফিলের খবর অনুযায়ী দারিদ্র্য থেকেই যাচ্ছে। এমনকি ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে কয়েক দশক ধরে তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হওয়ার পরেও জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি এই দাগটির নিচে থেকে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে দারিদ্র্য নিয়ে এই মুহূর্তে প্রামাণ্য সরকারি পরিসংখ্যানের বড়ই অভাব। ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (National Sample Survey Organization বা সংক্ষেপে NSSO) সর্বশেষ রিপোর্টটির প্রাথমিক খসড়া বার করে সরকার সেটা প্রত্যাহার করে নেয়। সেই খসড়া রিপোর্টটির প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে কিছু গবেষকের মতে দারিদ্র্যসীমার তলায় জনসংখ্যার অনুপাত নিয়ে শেষ যে সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ২০১১-১২ সালে— তার তুলনায় পরের কয়েক বছরে বেড়েছে। অন্য নানা সমীক্ষা থেকেও একই ছবি পাওয়া যাচ্ছে।

আসলে বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক আখ্যানটির মূল সমস্যা হল: দারিদ্র্য দূর করার জন্য আর্থিক বৃদ্ধি আবশ্যিক শর্ত হলেও তা পর্যাপ্ত শর্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আমরা এখন অতিমারি এবং জিডিপির সংকোচনকে উপেক্ষা করে বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ কল্পনা করে ফেললাম। তাহলেও গ্রামীণ দারিদ্র্যসীমার ঠিক কাছাকাছি আসা একজন ব্যক্তিকে এখানে স্রেফ জনপ্রতি আয়ের (যা বিশ্বমানের সাপেক্ষে খুবই কম) পর্যায়ে নিয়ে আনতেই এই ১০ শতাংশ হারে বার্ষিক বৃদ্ধি ধরে অন্তত ২২ বছর লেগে যাবে। আর শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার কাছে থাকা ব্যক্তির বেলায় ১৮ বছর সময় লাগবে। এখানে বলে রাখি, ইতিহাসে কোনো দেশেই বৃদ্ধির হার লাগাতার দুই দশক ধরে দুই-অঙ্কে স্থায়ী থাকেনি।

তাই, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি-ই যে শেষমেশ সবাইকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করবে, এরকম কোনো সিদ্ধান্তে এসে পড়ার আগে একটু থামা দরকার। আবার, আর্থিক বৃদ্ধি ছাড়া জনসংখ্যার যে বড় একটা অংশ চরম দারিদ্র্যে আছেন, তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না— বিনিয়োগ যত বাড়বে, বৃদ্ধির হার তত বাড়বে আর কর্মসংস্থান এবং মজুরির হারের বৃদ্ধির মাধ্যমে তার ফলে দারিদ্র্য কমবে।

সুতরাং, আসল প্রশ্ন হল: বৃদ্ধিকে কীভাবে আরও বেশি করে সর্বজনীন করা যায়? এবং, নিজে থেকে না হলে, কোন নীতির মাধ্যমে তা সহজতর করা যেতে পারে? কুজনেটস-এর মতে, বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে অসাম্য হ্রাস করবে। তিনি লেখেন যে, মূলধন পুঞ্জীভূত হওয়ার সাথে সাথে শ্রমের চাহিদা অবশেষে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়বে, এবং এইভাবে মজুরিও বাড়বে। এ ছাড়া, দক্ষতা থেকে অর্জিত

আয়েরও বৃদ্ধি হবে, যা মানব সম্পদের অধিক বিনিয়োগকেই উৎসাহিত করার পাশাপাশি ঊর্ধ্বমুখী অর্থনৈতিক চলমানতার দরজাও খুলে দেবে। এই সবই অসাম্য হ্রাস করার পাশাপাশি বৃদ্ধিও বাড়াবে।

অর্থনৈতিক চলমানতার দিকে মন দিলে আমরা অসাম্য বনাম বৃদ্ধির পুরোনো বিতর্কের কচকচানির বাইরে বেরোতে পারব। এতে অসাম্যের কোন দিকগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিকর, তাও দেখা যায়। স্রেফ গরিব ঘরে জন্মানোর কারণে যে মেধাবী মানুষজনের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, সফল উদ্যোক্তা হওয়া ও ভালো চাকরি পাওয়ার পরিবর্তে যাদের ছোটখাটো পেশায় জীবন কাটাতে হয়— সেখানেই অসাম্য সরাসরি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আঘাত করে। যে সমাজে প্রত্যেকের জীবনযাত্রার একটা ন্যূনতম সমমান বজায় থাকে, সবার জন্য কাজের সুযোগ থাকে, সেখানেও দক্ষতা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং ভাগ্যের হেরফেরের কারণে অসাম্য দানা বাঁধতে পারে। এখন কতটা অসাম্য সহনীয় তা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই আমাদের মতাদর্শের ওপর নির্ভর করে— অর্থাৎ, অভাবগ্রস্ত শ্রেণী নিয়ে আমরা কতটা ভাবিত, বা আমাদের অবস্থান কতটা অসাম্যবিরোধী। তবে, অসাম্যের কারণে যখন দরিদ্র শ্রেণীগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধে লাভ করতে পারে না (যেমন, ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পাঠাতে না পারা), তখন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় বাধা পড়ে। অবশ্যই, শুধু অর্থনৈতিক অসাম্যই যে অর্থনৈতিক চলমানতাকে বাধা দেয়, তা নয়— লিঙ্গ, বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক বৈষম্যও সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে ঊর্ধ্বমুখী অর্থনৈতিক চলমানতার কোনো প্রমাণ কি পাওয়া যায়? সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে (স্যামুয়েল অ্যাশার, পল নোভোসাড ও চার্লি র‍্যাফকিন, 'Intergenerational Mobility in India: New Methods and Estimates Across Time, Space, and Communities', 2021) দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর গড় আয় এবং শিক্ষাগত ফলাফলের কিছু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভারতে ঊর্ধ্বমুখী চলমানতা বছরের পর বছর কমই থেকে গেছে। যাঁরা জন্মে ইস্তক গরিব, তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিবই থেকে যাচ্ছেন, ফলস্বরূপ অসাম্য অব্যাহত থাকছে। যাঁরা পঞ্চাশের দশকে জন্মেছেন আর যাঁরা আশির দশকে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে এই ছবিটির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

চার

সুতরাং, ভারতে অসাম্যের সমস্যা যে গভীর, এবং তা ক্রমশ গভীরতর হয়ে চলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে যে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া

যা ২০১৬-র পর থেকে স্তিমিত হয়ে এসেছে (এবং কোভিড-পরবর্তী পর্যায়ে বড়রকম ধাক্কা খেয়েছে) তার ফলে গড় আয় বেড়েছে এবং সাম্প্রতিক জমানা বাদ দিলে দারিদ্র্য খানিক কমেছে, কিন্তু অসাম্যের এই মৌলিক ছবিটি পালটায়নি। সমস্যার মূলে আছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুযোগ নেওয়ার ক্ষমতার অসম বণ্টন, যা ঊর্ধ্বমুখী চলমানতার পথটি দরিদ্র শ্রেণীর কাছে দুর্গম করে রেখেছে।

আমাদের উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাই সুযোগের অসাম্যকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে প্রশ্নে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। স্পষ্টতই, এই প্রশ্নের একটা উত্তর হল দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রসার বাড়ানো। কিন্তু এই উত্তর আসলে আংশিক। বস্তুত, কর-রাজস্বের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ছাড়া এটি সম্ভব নয়। বিশেষ করে ধনীদের করের আওতায় আনার জন্য সচেতনভাবে আরও প্রচেষ্টা চালানো দরকার। কারণ, আয় এবং সম্পদ বণ্টনের সবচেয়ে উপরের এবং নীচের স্তরগুলি কিন্তু আসলে পরস্পরসংযুক্ত।

একটি ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে যে শুধুমাত্র ধনীরাই কর প্রদান করে। কিন্তু ভারতে প্রত্যক্ষ কর (ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেট কর) মোট রাজস্বের অর্ধেকমাত্র দেয়, বাকি অংশ আসে পরোক্ষ কর (জিএসটি, আবগারি এবং শুল্ক) থেকে। অতিমারি এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। উপরন্তু, গত এক দশকে, মোট কর-রাজস্বে কর্পোরেট করের অংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে পরোক্ষ কর এবং আয়কর বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সর্বশেষ যে হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট যে সংগৃহীত রাজস্ব তাতে পরোক্ষ করের অবদান এখন প্রত্যক্ষ করের থেকে বেশি— ২০২১ সালে প্রথমটি থেকে সংগ্রহ ১০.৭১ লক্ষ কোটি টাকা আর দ্বিতীয়টি থেকে সংগ্রহ হল ৯.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর একটা বড় কারণ হল আয়কর দেন জনসংখ্যার মাত্র ৫%। এর একটা বড় কারণ হল, নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, যাঁদের আয়করের আওতায় আনা মুশকিল। তার ওপরে ধনী হলেও কৃষিজীবীদের কোনো আয়কর দিতে হয় না। তার ওপরে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা অর্জন না করলে আয়কর দিতে হয় না, আর তার পরেও যে করের হার তা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম— বছরে পনেরো লক্ষ টাকার বেশি আয় করলে সর্বোচ্চ যে আয়করের হার চালু আছে তা হল মাত্র ৩০%।

পরোক্ষ করের ওপর সরকারের নির্ভরতার একটা বড় কারণ হল তা প্রত্যক্ষ করের তুলনায় সংগ্রহ করা সোজা। শুধু তাই নয়, মশার কামড়ের মতো করদাতার ওপর প্রত্যক্ষ করের তুলনায় এর প্রকোপ খানিকটা নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অনুপাত ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের ক্ষেত্রে বেশি, পরোক্ষ

করের অন্যপিঠ হল কার্যত এই কর অধোগতিশীল (regressive), যদিও করব্যবস্থার প্রাথমিক নীতি হল তা ঊর্ধ্বগতিশীল (progressive) হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে সম্পদ করের কথাও অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। ১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে ভারতে মোট সম্পদের ওপর কর আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১৫ সালে এটি তুলে নেওয়া হয়। এই করে সর্বশেষ প্রযোজ্য হার ছিল ৩০ লক্ষ টাকার বেশি সম্পদের উপর ১%। এই সম্পদ কর তুলে নিয়ে তার পরিবর্তে আসে এক কোটি টাকার বেশি উপার্জনকারী অতিবিত্তবানদের জন্য ২% অতিরিক্ত কর (surcharge)। ১৯৮৫ সাল থেকে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সম্পত্তির ওপর যে কর (estate duty), তাও তুলে দেওয়া হয়েছে। শেয়ার বাজারে দীর্ঘমেয়াদি লাভের ওপর করের হার মাত্র ১০% (এক লক্ষ টাকার বেশি অর্জন করলে) আর স্বল্পমেয়াদি লাভের ওপর করের হার মাত্র ১৫%। শুধু তাই নয়, এই হারগুলি ধনী শিল্পপতি বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সবার ক্ষেত্রেই এক। সর্বোচ্চ আয়করের হার যেখানে ৩০% (যা আগেই বলেছি অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটেই বেশি নয়), সেখানে বিনিয়োগ থেকে লাভের ওপর এত কম হারে কর আরোপ করার অন্তত কোনো নৈতিক বা নিদেনপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিও নেই।

পাঁচ

অসাম্যের যে নানা সূচক রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির নিরিখেই ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষ করে, সম্পদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ধনীদের নানা আর্থিক সুবিধার ফলাফলের ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়কে প্রতিফলিত করে। তাই সুযোগের সমতা সৃষ্টি করার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে অন্তত করের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সম্পদের ক্ষেত্রে অসাম্যের যা ভয়ংকর অবস্থা, যে সম্পদ কর লাগু করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকাঠামোতে বৃহত্তর বিনিয়োগেরও সুযোগ বাড়বে, সুযোগের সমতা তৈরি হবে এবং এতে আরও গতিশীল এক অর্থনীতির ভিত শক্তপোক্ত হবে।

তবে গত আট বছরের আর্থিক বৃদ্ধির হারের ক্রমহ্রাসমান গতিপথ এবং নানা সরকারি নীতিতে ধনীদের প্রতি পক্ষপাতের সুস্পষ্ট যে ছাপ, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে যতক্ষণ না বিকল্প কোনো রাজনৈতিক জমানার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে অন্তত এই মুহূর্তে খুব একটা আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না।

[এই লেখাটির জন্যে রামিয়া রাঘবন ও সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।]